অধ্যায় আট

গ্রাউন্ড জিরোর শূন্যতম ঘণ্টা

[স্থান-কালের সীমানায় শূন্য]

দেখে মনে হয়েছিল ভিনগ্রহবাসী

দেখতে পারবে না কোনো মর্তবাসী

তাদের শেষের ইতিহাসের নিবিড় বিনির্মাণ

—থমাস হার্ডি, দ্য কনভারজেন্স অব দ্য টোয়েন

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেন দুই দানবের লড়াই। বিশাল বড় বড় বস্তুর জগতে আধিপত্য সার্বিক আপেক্ষিকতার। এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সবচেয়ে ভারী বস্তুগুলো নিয়ে। এই যেমন নক্ষত্র, সৌরজগৎ ও ছায়াপথ। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার শাসন অতিশয় ক্ষুদ্র জগতে। পরমাণু, ইলেকট্রন ও অতিপারমাণবিক কণারা মেনে চলে এর নিয়ম। দেখে মনে হতে পারে, দুই তত্ত্ব মিলেমিশে কাজ করতে পারে। মহাবিশ্বের আলাদা আলাদা দিক পরিচালনার জন্য পদার্থবিদ্যার নিয়ম বেঁধে দিতে পারে।

কিন্তু এমন বস্তুও আছে যার অস্তিত্ব দুই জগতে জুড়েই আছে। ব্ল্যাকহোলের ভর সুবিশাল। অতএব, আপেক্ষিকতার আলোচ্যবস্তু এটা। একইসাথে আবার ব্ল্যাকহোল অতিশয় ক্ষুদ্র আকারের জিনিস। ফলে তা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আলোচ্যবিষয়। মিল তো দূরের কথা, দুই সূত্র ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতার মিলনবিন্দুতে শূন্যের বাস। আর শূন্যই দুই তত্ত্বকে দ্বন্দ্বে জড়ায়। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে ব্ল্যাকহোল একটি শূন্য। কোয়ান্টাম তত্ত্বের গণিতে ভ্যাকুয়ামের শক্তি শূন্য। মহাবিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনা বিগ ব্যাং। দুই তত্ত্বেই বিগ ব্যাং শূন্য। মহাবিশ্বের জন্ম শূন্য থেকে। মহাবিশ্বের সূচনা ব্যাখ্যা করতে গেলে দুই তত্ত্বই ///অকেজো///// হয়ে যায়।

বিগ ব্যাংকে বুঝতে হলে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আপেক্ষিকতার সাথে জোড়া দিতে হবে। গত কয়েক বছরে সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে। তৈরি হয়েছে এক দানবীয় তত্ত্ব। যা মহাকর্ষের ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে। ফলে পদার্থবিদরা মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তে দৃষ্টি দিতে পারছেন। এজন্য একটাই কাজ করতে হয়েছে। শূন্যের নির্বাসন। একীভূত এ তত্ত্বের নাম থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব।

সত্যি বলতে, সার্বিক তত্ত্ব আসলে শূন্যের তত্ত্ব।

শূন্যের নির্বাসন: স্ট্রিং তত্ত্ব

*সমস্যা হলো আমরা হিসাব করতে করতে শূন্য দূরত্বে পৌঁছে গেলে সমীকরণ বিস্ফোরিত হয়ে যায়। দেয় অর্থহীন সব উত্তর। অসীমের মতো জিনিস। কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার জন্মের পর এটা নিয়ে ব্যাপক ঝামেলা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা যেদিকেই হিসাব করছিলেন, পাচ্ছিলেন শুধু অসীম আর অসীম।*

—রিচার্ড ফাইনম্যান

সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মধ্যে বিরোধ অনিবার্য। আপেক্ষিকতার মহাবিশ্ব হলো মসৃণ এক রাবারের চাদর। মহাবিশ্ব অবিচ্ছিন্ন ও প্রবহমান। তীক্ষ্ণ বা বিন্দুসদৃশ নয়। অন্যদিকে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বলে এবড়োথেবড়ো ও বিচ্ছিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। শূন্য দুই তত্ত্বেই আছে। আর সেটাই তাদের দ্বন্দ্বের কারণ।

ব্ল্যাকহোলে আছে এক অসীম শূন্য। শূন্য পরিমাণ স্থানে জমা হয়েছে সব ভর। স্থান বেঁকেছে অসীম পরিমাণ। মসৃণ রাবারের চাদরে তৈরি করেছে একটি গর্ত। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণ শূন্যের তীক্ষ্ণতাকে ভয় পায়। ব্ল্যাকহোলে স্থান ও কালের নেই কোনো অর্থ।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও একই সমস্যায় আক্রান্ত। সমস্যাটা শূন্য-বিন্দুর শক্তি নিয়ে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সূত্র ইলেকট্রনের মতো কণাদেরকে বিন্দু মনে করে। তার মানে, এরা কোনো স্থান দখল করে না। ইলেকট্রন একটি শূন্যমাত্রিক বস্তু। এর শূন্যসদৃশ বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিজ্ঞানীরা এর ভর ও চার্জ জানেন না।

কথাটাকে হাস্যকর মনে হবে। প্রায় এক শ বছর আগে ইলেকট্রনের চার্জ ও ভর পরিমাপ করা হয়েছে। পরিমাপের পরেও একটা জিনিস কীভাবে বিজ্ঞানীদের অজানা থাকে? উত্তর আছে শূন্যের কাছে।

যে ইলেকট্রন বিজ্ঞানীরা দেখেন পরীক্ষাগারে, যে ইলেকট্রনকে পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও প্রকৌশলীরা যুগের পর যুগ ভালবেসে এসেছেন, সেটি মূলত আসল ইলেকট্রন নয়। ইলেকট্রনের নকল। আসল ইলেকট্রন ঢাকা পড়ে আছে কণার আবরণ দিয়ে। যে কণাদের জন্ম শূন্য-বিন্দুর ওঠানামার মাধ্যমে। প্রতি মহূর্তে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় এ কণারা। ভ্যাকুয়ামে অবস্থিত ইলেকট্রন মাঝেমধ্যেই ঐ একটি কণা শোষণ বা নির্গত করে। এই যেমন ফোটন কণা। এই কণার ঝাঁক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ পরিমাপের পথে বাধা। কারণ এ কণারা হিসাবে হস্তক্ষেপ করে। ঢেকে দেয় ইলেকট্রনের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য। পদার্থবিদদের দেখা ইলেকট্রনের চেয়ে আসল ইলেকট্রনের ভর চার্জ আরেকটু বেশি।

ইলেকট্রনকে আরেকটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা গেলে সঠিক ভর ও চার্জ আরও ভালোভাবে জানা যেত। কণার মেঘের মধ্যকার অতিশয় সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কার করা গেলে ইলেকট্রনকে আরও ভালোভাবে দেখা যেত। কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, পরিমাপ যন্ত্র মেঘের প্রথম কয়েকটি ভার্চুয়াল কণা পার হলে ইলেকট্রনের ভর একটু বাড়তে দেখা যায়। যন্ত্র ইলেকট্রনের আরও কাছে গেলে পার হবে আরও ভার্চুয়াল কণা। ফলে ইলেকট্রনের পর্যবেক্ষণকৃত ভর ও চার্জ আরও বাড়বে। যন্ত্র ইলেকট্রন থেকে শূন্য একক দূরত্বে গেলে এটি পার হয় অসীমসংখ্যক কণা। ফলে যন্ত্রের পরিমাপকৃত ভর ও চার্জও হয় অসীম। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম বলছে, শূন্যমাত্রিক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম।

শূন্য-বিন্দুর শক্তির মতোই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের অসীম ভর ও আর্জ উপেক্ষা করতে শিখেছেন। তাঁরা পুরো পথ পাড়ি দিয়ে ইলেকট্রনের শূন্য দূরত্ব পর্যন্ত যান না। ঠিক তার আগের কোনো এক জায়গায় থেমে যান। কাছাকাছি একটি সুবিধাজনক দূরত্ব বেছে নিলে ইলেকট্রের আসল ভর ও চার্জের সব হিসাব মিলে যায়। এ প্রক্রিয়ার নাম রিনর্মালাইজেশন বা পুনস্বাভাবিকীকরণ। রিচার্ড ফাইনম্যান বলেন, "আমি বলব এটা এক খামখেয়ালী কাজ।" যদিও তিনি নিজে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রিনর্মালাইজেশন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটিয়ে।

সার্বিক আপেক্ষিকতার মসৃণ চাদরে শূন্য গর্ত তৈরি করে। আবার ইলেকট্রনকে কুয়াশায় ঢেকে দিয়ে ইলেকট্রনের তীক্ষ্ণ বিন্দু চার্জকে ছড়িয়ে মসৃণ করে দেয়। তবে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা তো কাজই করে ইলেকট্রনের মতো শূন্যমাত্রিক বিন্দুকণা নিয়ে। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কণায়-কণায় হওয়া সব মিথষ্ক্রিয়াতেই অসীম চলে আসে। এগুলোই সিংগুলারিটি। যেমন দুটি কণা মিলিত হয় একটি বিন্দুতে। যা একটি শূন্যমাত্রিক সিংগুলারিটি। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বা সার্বিক আপেক্ষিকতায় এ শূন্যের কোনো অর্থ নেই। দুই মহান তত্ত্বকে নড়বড়ে করে দেয় শূন্য। ফলে পদার্থবিদরা একে বাদ দিয়েই কাজ করে গেলেন।

তবে শূন্যকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াটা ঠিক স্পষ্ট নয়। স্থান ও কালের পরতে পরতে দেখা মেলে শূন্যের। ব্ল্যাকহোল শূন্যমাত্রিক জিনিস। ইলেকট্রনের মতো কণারাও তাই। ইলেকট্রন ও ব্ল্যাকহোল বাস্তব জিনিস। চাইলেই এদেরকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে ব্ল্যাকহোল ও ইলেকট্রনকে বিজ্ঞানীরা একটি বাড়তি মাত্রা দিতে পারেন।

এ ধারণা থেকেই জন্ম স্ট্রিং তত্ত্বের। ১৯৭০-এর দশকে তত্ত্বটার জন্ম। পদার্থবিদরা দেখলেন, কণাকে বিন্দুর বদলে কম্পনশীল স্ট্রিং বা সুতা ধরে নিলে সুবিধা হচ্ছে। এ তত্ত্বে ইলেকট্রন ও ব্ল্যাকহোলকে শূন্যমাত্রিক বিন্দুর বদলে স্ট্রিংয়ের লুপ বা চক্রের মতো একমাত্রিক জিনিস মনে করা হয়। আর এতে করে সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অসীম অলৌকিকভাবে উধাও হয়ে যায়। রিনর্মালাইজেশন করতে হয় না। ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম আসেই না। শূন্যমাত্রিক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম, কারণ এটি একটি সিংগুলারিটি। এর কাছে যেতে থাকলে পরিমাপ বড় হয়ে অসীমের দিকে চলে যায়। তবে ইলেকট্রনকে স্ট্রিংয়ের লুপ ধরে নিলে কণাটি আর সিংগুলারিটি থাকে না। ফলে ভর ও চার্জও অসীম হয় না। কারণ এখন আর ইলেকট্রনের কাছে যেতে অসীমসংখ্যক কণার মেঘ পাড়ি দিতে হয় না। তাছাড়া দুটি কণার মিলন এখন আর বিন্দুসদৃশ সিংগুলারিটিতে হয় না। স্থান-কালের মধ্যে তারা তৈরি করে সুন্দর, মসৃণ ও অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠ।

চিত্র ৫৪: বিন্দু কণা তৈরি করে সিংগুলারিটি।

চিত্র ৫৫: স্ট্রিং কণা সিংগুলারিটি তৈরি করে না।

স্ট্রিং তত্ত্বে কণারা আসলে একই ধরনের স্ট্রিং। শুধু কাঁপে ভিন্নভাবে। মহাবিশ্বের সবকিছু এ স্ট্রিং দিয়ে তৈরি। ১০-৩৩ সেন্টিমিটার চওড়া এরা। স্ট্রিংয়ের আকারের নিউট্রন কণার সাথে তুলনা করা আর নিউট্রনকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করা একই কথা। এদের ক্ষুদ্র আকারের কারণে আমাদের মতো বড় প্রাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্রিংকে বিন্দুর মতো লাগে। লুপের আকারের চেয়ে ছোট দূরত্ব ও সময়ের কোনো গুরুত্ব নেই। তার নেই কোনো বাস্তব অর্থ। স্ট্রিং তত্ত্ব শূন্যকে মহাবিশ্ব থেকে অপসারণ করে। শূন্য দূরত্ব বা শূন্য সময় বলতে কিছু নেই। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সব অসীমের সমাধান হয়ে যায়।

শূন্যকে নির্বাসনে পাঠালে সার্বিক আপেক্ষিকতার অসীমেরও সমাধান হয়ে যায়। ব্ল্যাকহোলকে স্ট্রিং মনে করলে বস্তুরা আর স্থান-কালের কাঠামোর টোল বেয়ে পতিত হয় না। একটি কণার লুপ ব্ল্যাকহোলের লুপের দিকে যেতে যেতে প্রসারিত হয়। স্পর্শ করে ব্ল্যাকহোলকে। দুই লুপ কেঁপে ওঠে। ভেঙে গিয়ে তৈরি করে নতুন একটি লুপ। যা আসলে আরও ভারী একটি ব্ল্যাকহোল। (কোনো কোনো তাত্ত্বিকের বিশ্বাস, কণাকে ব্ল্যাকহোলের সাথে মিশালে ট্যাকিয়ন নামে এক ধরনের অদ্ভুত কণা তৈরি হয়। এদের ভর কাল্পনিক সংখ্যা (কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।)। ভ্রমণ করে অতীতের দিকে। আর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি। স্ট্রিং তত্ত্বের কিছু কিছু সংস্করণে এমন কণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।)

মহাবিশ্ব থেকে শূন্যের অপসারণকে মারাত্মক একটি কাজ মনে হতে পারে। তবে বিন্দুর চেয়ে স্ট্রিং সহজে কথা শোনে। শূন্যকে অপসারণের মাধ্যমে স্ট্রিং তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যার খণ্ড খণ্ড, কণাসদৃশ বৈশিষ্ট্যকে মসৃণ করে তোলে। সার্বিক আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাকহোলের সৃষ্ট ক্ষত সারিয়ে তোলে। এ সমস্যাগুলো দূর হলে দুই তত্ত্বের বিরোধ আর থাকে না। পদার্থবিদরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, স্ট্রিং তত্ত্ব কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাকে আপেক্ষিকতার সাথে জোড়া দেবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, এটা থেকে পাওয়া যাবে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ (quantum gravity) তত্ত্ব। যে সার্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে পারবে মহাবিশ্বের সব ঘটনার। তবে স্ট্রিং তত্ত্বের ছিল বেশ কিছু অসুবিধা। একটি সমস্যা হলো, তত্ত্বটির প্রয়োজন ১০টি মাত্রা।

বেশিরভাগ মানুষের কাছে চারটি মাত্রাই বেশি। এদের মধ্যে তিনটি মাত্রা দেখা খুব সহজ। ডান-বাম, সামনে-পেছনে আর উপর-নিচ হলো আমাদের চলাচলের তিনটি দিক। চতুর্থ মাত্রার আগমন ঘটে আইনস্টাইনের হাত ধরে। তিনি দেখালেন, সময়ও এ তিন মাত্রার মতোই একটি মাত্রা। আমরা প্রতিনিয়ত সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। যেভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে এগিয়ে যাই সড়কপথে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, ঠিক যেভাবে আমরা মহাসড়ক ধরে চলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তেমনি পারি সময়গাড়ি দিয়ে চলার গতি পরিবর্তন করতে। স্থানের মধ্য দিয়ে যত দ্রুত চলব, সময়ের মধ্য দিয়েও চলব তত দ্রুত। আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব বুঝতে হলে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, সময় হলো চতুর্থ মাত্রা।

চার মাত্রা নাহয় মেনে নিলাম। তাই বলে ১০? চারটি মাত্রা আমরা পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু অন্য ছয় মাত্রার কোথায় আছে? স্ট্রিং তত্ত্ব বলে, সে মাত্রাগুলো ছোট্ট বলের মতো গুটিয়ে আছে। এগুলো এত ছোট যে দেখা যায় না। এক পৃষ্ঠা কাগজকে দ্বিমাত্রিক মনে হয়। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখা যায়। তবে উচ্চতা বোঝা যায় না। তবে কাগজের প্রান্তকে আতশ কাচের নিচে নিয়ে দেখলে এর উচ্চতা চোখে ধরা দেয়। এটা দেখতে যন্ত্র দরকার হয়েছে। কিন্তু এই তৃতীয় মাত্রার অস্তিত্ব আছে। যদিও দেখা যায় না সাধারণ অবস্থায়। ঐ ছয়টি মাত্রার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এদের আকার ক্ষুদ্র বলে দৈনন্দিন জীবনে আমরা এদের দেখি না। এরা এতই ছোট যে নিকট ভবিষ্যতের তৈরি সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যাবে না।

এ ছয়টি বাড়তি মাত্রার কী অর্থ? আসলে কোনো অর্থই নেই। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা সময়ের মতো আমাদের চেনাজানা কোনোকিছুর পরিমাপ নয় এগুলো। এগুলো নিছক গাণিতিক কাঠামো। যার মাধ্যমে স্ট্রিং তত্ত্বের গণিত যেভাবে কাজ করা দরকার তা করে দেয়। কাল্পনিক সংখ্যার (কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে পড়ুন ৬ষ্ট অধ্যায়ে) মতোই আমরা এদেরকে দেখতে পাই না। অনুভব করি না বা গন্ধ পাই না। যদিও হিসাব করার জন্য এগুলো প্রয়োজন। ধারণাটা বাস্তবে অদ্ভুত। তবুও বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন। কারণ সমীকরণগুলো বোধ্যগম্য না হলেও তত্ত্বটি অনুমানে পারদর্শী। আর বাড়তি ছয়টি মাত্রা তো আর গাণিতিকভাবে কারও পাকা ধানে মই দেয় না। সমস্যা হবে হয়তোবা এদেরকে দেখা গেলে। (আজকাল তো দশও কম মনে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে পদার্থবিদরা বুঝতে পারেন, স্ট্রিং তত্ত্বের বিভিন্ন রকম সংস্করণ আসলে এক অর্থে একই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন, এ তত্ত্বগুলো একে অপরের দ্বৈত রূপ। যেভাবে পঁসলে বুঝেছিলেন, রেখা ও বিন্দু একে অপরের দ্বৈত রূপ। বিজ্ঞানীদের এখন বিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বী সব তত্ত্বের পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে দানবীয় এক তত্ত্ব। এর নাম তথাকথিত এম-তত্ত্ব। যা আবার বাস করে দশের বদলে এগারো মাত্রায়।

স্ট্রিংকে আরও সাধারণ অর্থে বলা হয় ব্রেইন। বহুমাত্রিক মেমব্রেইন থেকে নামটা আসা। এরা এত ক্ষুদ্র যে কোনো যন্ত্র দিয়েই এদেরকে দেখার কোন আশা নেই। অন্তত আমাদের সভ্যতার আরও অনেক অনেক বেশি উন্নত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই। কনাপদার্থবিদরা অতিপারমাণবিক জগত দেখেন কণাত্বরকের (যে যন্ত্র কণাকে বিশাল বেগে চালিত করে) সাহায্যে। চুম্বকক্ষেত্র বা অন্যকোনো ক্ষেত্র কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে অনেক বেশি বেগে ধাবিত করা হয়।এ কণারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়ে যায়। কনাত্বুরক হলো অতিপারমাণবিক জগতের মাইক্রোস্কোপ। এসব কণায় যত বেশি শক্তি দেওয়া হবে, মাইক্রোস্কোপ তত শক্তিশালী হবে। আর ততই ক্ষুদ্র বস্তু দেখা যাবে।

এমন এক কণাত্বরকের নাম সুপাকন্ডাক্টিং সুপার কোলাইডার। ১৯৯০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত বহু বিলিয়ন ডলারের এ যন্ত্র বানানোর পরিকল্পনা ছিল। নির্মিত হলে এটি হত সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী কণাত্বরক। ৫৪ মাইল লম্বা লুপের মধ্যে ১০,০০০ চুম্বক থাকার কথা ছিল এতে। এত শক্তিশালী যন্ত্রও গুটিয়ে থাকা মাত্রাগুলো বা স্ট্রিং দেখার জন্য যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, কণাত্বুরক দিয়ে স্ট্রিং দেখার ব্যবস্থা করা যাবে। সেজন্য কণাত্বরককে হতে হবে ৬০ কোটি-কোটি মাইলের একটি লুপ। একটি কণা আলোর বেগে চললেও এত বড় দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগবে ১,০০০ বছর।

বর্তমানে কল্পনাযোগ্য কোনো যন্ত্র দিয়েই বিজ্ঞানীরা সরাসরি স্ট্রিং দেখার আশা করতে পারেন না। এমন কোনো পরীক্ষার সন্ধান কেউ দিতে পারবে না, যার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা যাবে ব্ল্যাকহোল ও কণা আসলেই স্ট্রিং কিনা। স্ট্রিং তত্ত্বের বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বড় আপত্তি। বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নির্ভর। তাই কেউ কেউ বলেন, স্ট্রিং তত্ত্ব আসলে বিজ্ঞান নয়, বরং দর্শন। (সাম্প্রতিক এক গুচ্ছ তত্ত্ব বলছে, কিছু সংকীর্ণ মাত্রা লম্বায় ১০-১৯ সেন্টিমিটার বা আরও বড় হতে পারে। সেক্ষেত্রে এগুলো পরীক্ষারযোগ্য হবে। তবে এখনও পর্যন্ত এ তত্ত্বগুলোকে ভুলই মনে হচ্ছে। ভাবনাগুলো চমৎকার। কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য।

নিউটন মহাকর্ষ ও গতিসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে গ্রহ ও অন্যান্য বস্তুর চলাচলের ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন পদার্থবিদরা। নতুন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হলেই নিউটনের হিসাবের পক্ষে সমর্থন জোরালো হত। তবে কিছু সমস্যা ছিল। একটি সমস্যা ছিল বুধ গ্রহের কক্ষপথ। গ্রহটির কক্ষপথ যেভাবে দুলে ওঠে তা মেলে না নিউটনের পূর্বাভাসের সাথে। তবে সার্বিকভাবে নিউটনের তত্ত্ব একের পর একে পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছিল।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিউটনের ভুলগুলো সংশোধন করে। সমাধান হত বুধ গ্রহের গতির। এ তত্ত্বগুলো মহাকর্ষ সম্পর্কে পরীক্ষাযোগ্য পূর্বানুমানও করে। সূর্যগ্রহণের সময় এডিংটন নক্ষত্রের আলোর বাঁক পর্যবেক্ষণ করেন। সত্য হয় একটি অনুমান।

অন্যদিকে স্ট্রিং তত্ত্ব অনেকগুলো প্রচলিত তত্ত্বকে সুন্দরভাবে জোড়া দেয়। ব্ল্যাকহোল ও কণার আচরণ সম্পর্কে বেশ কিছু পূর্বাভাসও দেয়। তবে এগুলোর কোনোটিই পরীক্ষাযোগ্য নয়। নয় পর্যবেক্ষণযোগ্য। গাণিতিকভাবে হয়ত তত্ত্বটা সুসঙ্গত। এমনকি সুন্দরও। তবে এটা এখনও বিজ্ঞানের অংশ নয়১।

আগামীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটা অনুমান করা যায়, তাতে মনে হচ্ছে স্ট্রিং তত্ত্ব একটি দার্শনিক ভাবনা হিসেবেই থাকবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে না। তত্ত্বটা সঠিকও হতে পারে। তবে সেটা যাচাই করার কোনো উপায় আমরা খুঁজে নাও পেতে পারি। শূন্য এখনও মহাবিশ্ব থেকে উধাও হয়নি। বরং মনে হচ্ছে শূন্যই মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য দায়ী।

শূন্যতম ঘণ্টা: বিগ ব্যাং

*হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা গেল, বিগ ব্যাং নামে একটি সময়ে মহাবিশ্ব সম্ভবত অতিশয় ক্ষুদ্র ও ঘন ছিল। এরকম অবস্থায় বিজ্ঞানের সব সূত্র অকেজো হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়।*

—স্টিফেন হকিং, অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম

মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে শূন্য দিয়ে। জন্মের আগে ছিল না কোনোকিছুই। একদম শূন্যতা থেকে হলো আকস্মিক এক বিস্ফোরণ। আর তা থেকে সৃষ্টি হলো পুরো মহাবিশ্বের সব পদার্থ ও শক্তি। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিগ ব্যাংয়ের এ ধারণাকে উদ্ভট মনে করতেন। মহাবিশ্ব সসীম ও এর একটি সূচনা আছে—এ কথায় একমত হতে জ্যোতির্পদার্থবিদদের বহু সময় লেগে যায়।

সসীম মহাবিশ্বের প্রতি ঘৃণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। এরিস্টটল ভয়েড বা শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির ধারণা মেনে নেননি। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল শূন্যতার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। কিন্তু এতে একটি প্যারাডক্সের উদ্ভব হয়। মহাবিশ্বের জন্ম ভয়েড থেকে হয়ে না থাকলে, জন্মের আগে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল। মহাবিশ্বের আগে দরকার আরেকটি মহাবিশ্ব। এরিস্টটলের কাছে এ ধাঁধাঁর একটাই সমাধান: মহাবিশ্ব চিরন্তন। অতীতে সবসময় এর অস্তিত্ব ছিল। ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে সে ধারা।

একটা সময় এসে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এরিস্টটল ও বাইবেলের মধ্যে একটি বেছে নিতে হলো। বাইবেল বলে, সসীম মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে শূন্যতা থেকে। একসময় মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেমেটিক বাইবেলের মহাবিশ্বের ধারণা এরিস্টটলের ধারণাকে বিদায় করে দিল। তবে চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ধারণা পুরোপুরি বাতিল হয়নি। বিংশ শতকে এসেও টিকে ছিল ধারণাটি। এ ধারণাই আইনস্টাইনকে তাঁর নিজের ভাষ্যমতে নিজের জীবনের সেরা ভুল কাজটার দিকে ঠেলে দেয়।

আইনস্টাইনের মনে হত, তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতায় বড় এক ভুল আছে। তত্ত্বটা বলে, মহাবিশ্ব একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে মহাবিশ্ব অস্থিতিশীল। সম্ভাবনা আহে দুটি। এর কোনোটিই সুখকর নয়।

একটা সম্ভাবনা হলো মহাবিশ্ব নিজের মহাকর্ষের চাপে গুটিয়ে যাবে। সংকীর্ণ হতে হতে উত্তপ্ত হতে থাকবে মহাবিশ্ব। জ্বলে জ্বলে উজ্জ্বল বিকিরণ তৈরি করবে। ধ্বংস হবে সব ধরনের প্রাণ ও বস্তুর সব উপাদান পরমাণু। মৃত্যু হবে আগুনের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্ব সংকীর্ণ হয়ে ব্ল্যাকহোলের মতো শূন্যমাত্রিক বিন্দুতে পরিণত হবে। উধাও হয়ে যাবে চিরতরে।

অন্য সম্ভাবনাটা আরও নির্মম। মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। ছায়াপথরা একে অপর থেকে দূরে সরতে থাকবে। মহাবিশ্বের সব তেজস্বী বিক্রিয়ার জন্য দায়ী নাক্ষত্রিক উপাদানগুলো হালকা হয়ে যাবে। জ্বলানি ফুরিয়ে নক্ষত্র নিভে যাবে। ছায়াপথ হবে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার। আর তারপর শীতল ও নীরব। নক্ষত্রের শীতল ও মৃত পদার্থ ক্ষয় যাবে। পেছনে পড়ে থাকবে শুধু ঝাপসা বিকিরণ। যা ভরপুর থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। মহাবিশ্ব হবে ক্ষীয়মান আলোর এক শীতল স্যুপ। এটা হবে এক শীতল মৃত্যু।

আইনস্টাইনের কাছে এ ভাবনাগুলোকে জঘন্য লাগত। এরিস্টটলের মতোই তিনি ধরেই নিয়েছিলেন মহাবিশ্বটা স্থির, ধ্রুব ও চিরন্তন। তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণগুলোকে "ঠিক করার" একমাত্র উপায় হলো আসন্ন ধ্বংসকে প্রতিহত করা। কাজটা তিনি করলেন সমীকরণে একটি ধ্রুবক বসিয়ে দিয়ে। এর নাম মহাজগাতিক ধ্রুবক (cosmological constant)। অজানা যে বল কাজ করে মহাকর্ষের বিপরীতে। এ ধ্রুবকের ধাক্কা মহাকর্ষের টানকে ঠেকিয়ে দেবে। গুটিয়ে না গিয়ে মহাবিশ্ব ভারসাম্যে থাকবে। সঙ্কোচন বা প্রসারণ কোনোটাই হবে না। এমন এক রহস্যজনক বলের প্রস্তাব করাটা এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। তিনি বলেন, “আমি মহকর্ষ তত্ত্বে ... আবারও এমন একটি কাজ করে বসেছি, যার কারণে আমাকে পাগলাগারদে বন্দি হওয়া লাগতে পারে।" তবুও মহাবিশ্বের আসন্ন ধ্বংসের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে এমন নাটকীয় পদক্ষেপ নেন তিনি।

আইনস্টাইনকে পাগলাগারদে যেতে হয়নি। এর আগে আরও অদ্ভুত জিনিস প্রকাশ করেও তিনি সঠিক প্রমাণিত হয়েছিলেন। তবে এবার আর তাঁর ভাগ্য তত ভাল ছিল না। নক্ষত্ররা নিজেরাই আইনস্টাইনের স্থির ও চিরন্তন জগতের ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

১৯০০ সালে আকাশগঙ্গাই ছিল মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচিত অঞ্চল। নক্ষত্রের এ ধূলিময় চাকতির বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে সে সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। হ্যাঁ, বহু দূরে জ্বলজ্বল করা কুঞ্চিত মেঘ তাঁরা দেখেছেন। তবে সেগুলোকে ছায়াপথের ভেতরের গ্যাস মনে না করার তেমন কোনো কারণ ছিল না। ১৯২০-এর দশকে সবকিছু বদলে গেল। আর এর পেছন অবদান অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবলের।

হাবল সিফিড বিষম তারা নিয়ে কাজ করেন। এগুলোর মাধ্যমেই তিনি বহুদূরের বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করেন। এ তারাগুলোর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এরা অনুমিত উপায়ে স্পন্দিত হয়। চলতে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল হওয়ার চক্র। এদের স্পন্দনের সাথে সম্পর্ক আছে নির্গত আলোর পরিমাণের। এদেরকে তাই বলে আদর্শ বাতি (standard

candles)। যে বস্তুর উজ্জ্বলতা আমরা জানি। হাবলের কাজের মূল অংশ ছিল এগুলোই। এদের আচরণ ছিল ট্রেনের হেডলাইটের মতো।

এগিয়ে আসা ট্রেনের দিকে তাকালে দেখবেন, হেডলাইটের আলো ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। এখন ধরুন ট্রেনের আলোটা একটা আদর্শ বাতি। আমরা জানি, এটা থেকে কতটুকু আলো বের হচ্ছে। তাহলে কত দূরে থাকলে কত উজ্জ্বল হবে তাও আমরা বলতে পারব। যত কাছে আসবে, তত উজ্জ্বল হবে। একই যুক্তি উল্টোভাবেও কাজ করে। হেডলাইট কতটুকু আলো দিচ্ছে তা জানলে আমরা এর আপাত উজ্জ্বলতা পরিমাপ করে সেখান থেকে ট্রেনের দূরত্ব বের করতে পারব।

সিফিড তারা দিয়ে হাবল ঠিক এ কাজটাই করেন। তাঁর দেখা বেশিরভাগ নক্ষত্র ছিল দশ থেকে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ পর্যন্ত দূরের। তবে অ্যানড্রোমিডা নীহারিকা (তখন এ নামটাই প্রচলিত ছিল) দেখে তিনি চমকে গেলেন। কুঞ্চিত এ মেঘের ভেতর একটি সিফিড তারা মিটমিট করছিল। আলোর পরিমাপ থেকে হিসাব করে দেখলেন, নীহারিকাটির দূরত্ব ১০ লাখ আলোকবর্ষ। যা আমাদের ছায়াপথের শেষ সীমানা থেকেও দূরে। অ্যানড্রোমিডা জ্বলজ্বলে গ্যাসের কোনো মেঘ নয়। এটা নক্ষত্রেরই এক মেঘ (ছায়াপথ)। দূরত্বের কারণে নক্ষত্রগুলো আলাদা আলোকবিন্দু হিসেবে ধরা দেয় না। দেখতে ঝাপসা লাগে। অন্যান্য কুঞ্চিত ছায়াপথ ছিল আরও দূরে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বের সর্বত্র ছায়াপথপুঞ্জ দিয়ে পরিপূর্ণ।

হাবলের এ আবিষ্কার ছিল অভূতপূর্ব। দেখা গেল, আগের ধারণার চেয়ে মহাবিশ্ব বহ লক্ষ গুন বড়। তবে এ পর্যবেক্ষণ অসাধারণ হলেও হাবল এ কারণে স্মরণীয় হননি। হাবলের দ্বিতীয় আবিষ্কার আইনস্টাইনের চিরন্তন মহাবিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

সিফিড তারার সাহায্যে হাবল একের পর এক ছায়াপথের দূরত্ব বের করতে লাগলেন। ভয়াল এক বিন্যাস খুঁজে পেতেও সময় লাগল না বেশিদিন। সবগুলো ছায়াপথ উচ্চবেগে আকাশগঙ্গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে২। প্রতি সেকেন্ডে সরে যাওয়ার বেগ কয়েক শ মাইল বা তারও বেশি। ছায়াপথগুলো এত দূরে যে এদের বিশাল বেগও সরাসরি পরিমাপযোগ্য নয়।

ছায়াপথের দূরত্ব মাপার একমাত্র পথ ডপলার প্রভাব। মহাসড়কের পুলিশ এ নীতি কাজে লাগিয়েই গাড়ির গতি মাপে। হয়তোবা খেয়াল করে থাকবে, রেলগাড়ি আপানকে অতিক্রম করে গেলে এর শব্দের পিচ বদলে যায়। ট্রেন কাছে আসার সময় এর পিচ বেশি থাকে। অতিক্রম করে চলে গেলে পিচ হটাৎ করে অনেক নিচু হয়ে যায়। এটা হওয়ার কারণ ট্রেনের গতির কারণে সামনের শব্দতরঙ্গ পেছনের তরঙ্গের চাপে বড় হয়ে যায়। ফলে কম্পাঙ্ক ও পিচ টোন বড় হয়। আর পেছনের তরঙ্গকে লম্বা করে দেয়। কম্পাঙ্ক ও পিচ টোন কমে যায় (চিত্র ৫৬)। এটাই ডপলার প্রভাব। এটা আলোর ক্ষেত্রেও কাজ করে। নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে আসলে আলো চাপা খেয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্ক তৈরি হয়। বর্ণালির নীল রংয়ের দিকে সরে যায় আলো। এর নাম নীলসরণ। নক্ষত্র দূরে সরে গেলে ঘটে উল্টোটা। আলো লম্বা হয়ে যায়। ঘটে লোহিতসরণ।

পুলিশ এভাবেই গাড়ির গতি বুঝতে পারে। কাঙ্খিত গাড়ি থেকে প্রতিফলিত বেতার রশ্মির সরণ থেকে হিসাবটা করা হয়। একইভাবে নক্ষত্রের বর্ণালী দেখে বোঝা নক্ষত্র কত জোরে চলছে। আমাদের দিকে আসছে, নাকি দূরে চলে যাচ্ছে।

হাবল দূরত্বের উপাত্তকে ডপলার গতির উপাত্তের সাথে মিলিয়ে দেখলেন। ফলাফল দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। সবদিকের ছায়াপথ আমাদের কাছ থেকে শুধু দূরেই সরছে না, বেশি দূরের ছায়াপথ বেশি দ্রুত সরে যাচ্ছে।

চিত্র ৫৬: ডপলার প্রভাব

এটা কীভাবে সম্ভব? ধরুন, একটি বেলুনে একই আকারের অনেকগুলো ডট আছে। এ ডটগুলো ছায়াপথের সাথে তুলনীয়। আর বেলুন নিজে হলো স্থান-কালের কাঠামো। বেলুন বড় হলে ডটগুলো একে অপর থেকে দূরে সরতে শুরু করে। যেকোনো ডট থেকে দেখলেই অন্য ডটগুলোকে ছুটে যেতে দেখা যাবে। দূরের ডটগুলো কাছের ডটের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে (চিত্র ৫৭)। মহাবিশ্বকেও দেখে বেলুনের মতো প্রসারিত হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। (বেলুনের উপমায় কিছু ত্রুটি আছে। বেলুন বড় হওয়ার সাথে সাথে বেলুনের ডটগুলোও বড় হয়। তবে ছায়াপথের আকার বদলায় না। আটকে থাকে নিজের মহাকর্ষের বাঁধনে।)

চিত্র ৫৭: প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

সময় গড়াবার সাথে সাথে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলে। জিনিসটাকে অন্যভাবেও কল্পনা করা যায়। ধরুন আপনার কাছে মহাবিশ্বের ইতিহাসের একটি চলচ্চিত্র আছে। একে পেছন দিকে চালিয়ে দিলে দেখা যাবে, মহাবিশ্ব গুটিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় এসে বেলুন কুঁচকে শুকিয়ে যাবে। ছোট থেকে হবে আরও আরও ছোট। আর শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দু হয়ে উধাও হয়ে যাবে। এটাই হলো স্থান ও কালের সূচনার সিংগুলারিটি। এটাই সবচেয়ে আদিম শূন্য। মহাবিশ্বের জন্মস্থান। এটাই বিগ বিগ ব্যাং। এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, যার মাধ্যমে জন্ম হয় মহাবিশ্বের। এ সিংগুলারিটি থেকেই বেরিয়ে আসে মহাবিশ্বের সব পদার্থ ও শক্তি। জন্ম হয় ছায়াপথ, নক্ষত্র ও গ্রহের। যাকিছু তৈরি হয়েছে ও যা ভবিষ্যতে হবে সবকিছুর উপদান প্রস্তুত হয়। মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। যা প্রায় ১৫০০ কোটি বছর (আরও সূক্ষ্ম হিসাবে ১৩৮০ কোটি বছর) আগের কথা। আর তখন থেকেই স্থান প্রসারিত হয়ে চলেছে। আইনস্টাইনের স্থির ও চিরন্তন মহাবিশ্বের আশা শেষ হয়ে গেল।

শেষ আশার কিরণ ছিল বিগ ব্যাংয়ের বিকল্প এক তত্ত্বে। এর নাম স্থিরাবস্থা তত্ত্ব (steady-state theory)। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ বললেন, ফোয়ারা থেকে নির্গত হয় পদার্থ। ছায়াপথরা এসব ফোয়ারা থেকে দূরে সরে যায়। বয়স বেড়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আলাদা আলাদাভাবে ছায়াপথগুলো দূরে গিয়ে মরে গেলেও সার্বিকভাবে পুরো মহাবিশ্ব অপরিবর্তিত থাকে। সবসময় একটি সাম্যবস্থা বজায় থাকে। কারণ প্রতিনিয়ত নতুন পদার্থ তৈরি হয়। এরিস্টটলের চিরন্তন মহাবিশ্ব টিকে রইল।

কিছু সময় পর্যন্ত বিগ ব্যাং ও স্থিরাবস্থা তত্ত্ব পাশাপাশি অবস্থান করছিল। বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ দর্শন অনুসারে যেকোনো একটি বেছে নিতেন। ১৯৬০-এর দশকে পাল্টে গেল সবকিছু। মৃত্যু হলো স্থিরাবস্থা তত্ত্বের। সে মৃত্যুর সঙ্কেতকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন কবুতরের মল (সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে)।

১৯৬৫ সালের কথা। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদরা হিসাব করার চেষ্টা করছিলেন, কী হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরপর। পুরো মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই ছিল উত্তপ্ত ও ঘন। জ্বলজ্বল করছিল উজ্জ্বল আলোয়। বেলুন মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে সে আলো নিশ্চয় হারিয়ে যায়নি কোথাও। তবে স্থান-কালের রাবারের কাঠামোর সাথে সাথে সে আলো লম্বা হয়ে গিয়ে থাকবে। কিছু হিসাব-নিকাশ শেষে প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, সে আলো থাকবে বর্ণালীর মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলে৩। আর নির্গত হবে চতুর্দিক থেকে। এ আলোর নাম মহাজগতিক পটভূমি বিকিরণ। এটা বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ-পরবর্তী আলো। এর অস্তিত্ব শনাক্ত করা গেলেই বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাংয়ের পক্ষে প্রথম কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে পাবেন। আরও প্রমাণ হবে, স্থিরাবস্থা তত্ত্ব ভুল।

প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীদেরকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁদের অনুমানের পক্ষে প্রমাণ চলে এল। প্রিন্সটনের পাশেই আছে নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের মারে হিল এলাকার বেল ল্যাবস গবেষণাগার। এখানে দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সংবেদনশীল মাইক্রোওয়েভ রশ্মি শনাক্তের যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও যন্ত্র কথা শুনছিল না। রেডিও অনুষ্ঠানের হিস হিস শব্দের মতো একটি শব্দ বাজছিল। কোনোভাবেই একে দূর করা যাচ্ছিল না। প্রথমে ভাবলেন, অ্যান্টেনার বাসায় থাকা কবুতরের মল এজন্য দায়ী। পাখিকে তাড়ানো হলো। মল পরিষ্কার করা হলো। তবুও গেল না হিস হিস শব্দ। চেষ্টার কোনো কমতি করলেন না দুজন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এর মধ্যে তাঁরা প্রিন্সটনের গবেষক দলের কাজের ব্যাপারে জানতে পারলেন। বুঝলেন, তাঁরা পেয়ে গেছেন মহাজগতিক পটভূমি বিকিরণ। এ নয়েজ কবুতরের মল থেকে আসেনি। এটা বিগ ব্যাংয়ের আলোর হিস হিস। লম্বা ও বিকৃত হয়ে এ অবস্থা হয়েছে। (এ আবিষ্কারের জন্য সে দুই ইঞ্জিনিয়ার আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নোবেল পুরস্কার পান। প্রিন্সটন গবেষণা দলে কাজের অগ্রভাগে ছিলেন বব ডিক জিম পিবলস। তাঁরা কিছুই পেলেন না। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন, অবিচার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি। নোবেল কমিটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে আমলে নেয় না। পুরস্কার দেয় নিবিড় যত্নে করা পরীক্ষাকে।)

ভ্যাকুয়ামের শূন্য হয়ত মহাবিশ্বের ভাঁজের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। মহাবিশ্বের প্রতিটি জায়গার ভ্যাকুয়াম ভার্চুয়াল কণা দিয়ে পরিপূর্ণ। ফলে মহাবিশ্বের কাঠামোয় শূন্য-বিন্দুর শক্তি অসীম। উপযুক্ত অবস্থায় এ শক্তি বস্তুকে ধাক্কা দিতে পারে। প্রাথমিক মহাবিশ্বে হয়ত সেটাই হয়েছে।

১৯৮০-এর দশকে পদার্থবিদিরা বলেন, প্রাথমিক মহাবিশ্বের শুন্য-বিন্দুর শক্তি হয়ত এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। এ বাড়তি শক্তি সবদিকে প্রসারিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকবে। যার ফলে স্থান ও কালের কাঠামো বিশাল গতিতে বাইরের দিকে চাপ অনুভব করবে। শক্তির বিশাল বিস্ফোরণ বেলুনকে স্ফীত বা বড় করে তোলে। মহাবিশ্বের ভাঁজগুলো মসৃণ হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে বেলুনে বাতাস দিলে এর কুঁচকানো অংশগুলো মসৃণ হয়ে যায়। এ থেকে মহাবিশ্ব তুলনামূলক মসৃণ হওয়ার কারণ বোঝা যায়। তবে প্রথম কিছু মুহূর্তের ভ্যাকুয়াম হলো নকল ভ্যাকুয়াম। এর শূন্য-বিন্দুর শক্তি অস্বাভাবিক রকম বেশি। শূন্য-বিন্দুর উচ্চ শক্তির অবস্থা একে ভেতরে ভেতরে অস্থিতিশীল করে তোলে। খুব দ্রুত সে নকল ভ্যাকুয়াম ভেঙে পড়ে। এতে সময় লাগে এক সেকেন্ডের বহুকোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। নকল ভ্যাকুয়াম ধ্বংস হয়ে ফিরে আসে আসল ভ্যাকুয়াম। আমরা এখন মহাবিশ্বে এরই শূন্য-বিন্দুর শক্তি দেখি। এটা ছিল এক বোতল পানির মতো। মুহূর্তের মধ্যে যা অতিউত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আসল ভ্যাকুয়ামের ছোট ছোট বুদ্বুদ তৈরি হয়। প্রসারিত হয় আলোর বেগে। আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব এমনই এক বুদ্বুদের মধ্যে আছে। অথবা আছে একসঙ্গে যুক্ত কয়েকটি বুদ্বুদের সমাবেশের মধ্যে।

তথ্যনির্দেশ

১। হ্যাঁ, গণিত সুন্দর হতে পারে আবার বিশ্রীও হতে পারে। সঙ্গীত বা চিত্রকর্মকে নান্দনিকভাবে রুচিশীল করার কৌশল ঠিক করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন গাণিতিক উপপাদ্য বা পদার্থবিদ্যার তত্ত্বকে সুন্দর করে তোলার পদ্ধতি বের করা। সুন্দর তত্ত্ব হবে সরল এবং ছোট ও সংক্ষিপ্ত। এটি এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা ফুটিয়ে তুলবে। প্রায়শই থাকবে প্রতিসাম্যের রহস্যজনক তাৎপর্য। আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো বিশেষভাবে সুন্দর। সুন্দর ম্যাক্সুওয়েলের সমীকরণগুলো। তবে অনেকের মতেই অয়লারে আবিষ্কৃত একটি সমীকরণ গাণিতিক সৌন্দর্যের সবচেয়ে নিখুঁত উদাহরণ। সমীকরণবটা হলো eiπ+1=0। কারণ অতিসরল ও ছোট্ট এই সূত্র সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গণিতের সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ সংখ্যাগুলোকে একই সুতোয় গাঁথে।

সূত্রটি নিয়ে আরও জানতে পড়ুন

ক। বিস্তারিত পড়ুন, অয়লারের ফর্মুলা এত দারুণ কেন? পড়তে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।



খ। সূত্রটির প্রমাণ পাবেন এখানে - <https://docs.statmania.info/resources/Nice_Math.pdf>

২। ব্যতিক্রমও আছেন। যেমন অ্যানড্রোমিডা ছায়াপথই। মহাবিশ্বের প্রসারণ ফাঁকি দিয়ে মহাকর্ষের প্রভাবে এটা আকাশগঙ্গার কাছে আসছে।

৩। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে বিকিরণ দুর্বল হয়ে পড়ে। চলে আসে বর্ণালীর মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলে। দৃশ্যমান আলোর চেয়ে এ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়, কম্পাঙ্ক কম। তাই শক্তিও কম।

চিত্র ৫৭.১: তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালী